শ্রমিক শ্রেণীর কবরের অধিকার

সায়দিয়া গুলরুখ

'জোড়ামানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকি-মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।'
–কবর, জসীম উদ্‌দীন

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। ঢাকার বিমানবন্দরের কার্গো গেট। কিছুক্ষণ হলো ঘড়িতে সন্ধ্যা ৭টা বেজেছে। টেলিভিশন সাংবাদিকরা ক্যামেরাসহ ব্যস্তচিত্তে ঘোরাফেরা করছেন। এক পাশে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানা বয়সের কয়েকজন পুরুষ বসে আছেন। খানিকক্ষণ পরে বিমানবন্দরের কুলিরা কার্গো গেটের বিশাল ফটক খুলে দেয়। ছোট ক্যারিয়ার ভ্যানে একটা একটা করে কফিনের বাক্স বের করে আনে। প্রতিটি কফিনের ওপর গাঢ় নীল রঙের স্কচটেপ দিয়ে মৃত শ্রমিকের পাসপোর্টের ফটোকপি লাগানো। পাঞ্জাবির হাতায় চোখের পানি মুছতে মুছতে শাহদাত হোসেন ও তিতু আহমেদের বাবা শাহ আলম কফিনগুলোর দিকে এগিয়ে যান। সাথে আসা ভাইপো পাসপোর্টে নাম দেখে কফিন শনাক্ত করে। শীতের রাতে জোয়ান-সোমত্ত দুই ছেলের লাশ নিয়ে কচুয়ার পথে রওনা দিলেন তাঁরা। দুই ভাই বাহরাইনে শ্রমিক ছিলেন। ঠিক কী করতেন সেখানে তা স্বজনদের জানা নেই। আর দশজন বাংলাদেশি শ্রমিকের সাথেই ছিল তাঁদের ডেরা। শেওলা মোড়ানো চার দেয়াল। জানালাবিহীন ছোট্ট ঘর। চারটা বাংক বেড। চার্জে দেয়া মোবাইলগুলো ঘরের একমাত্র প্রাচুর্য। ঘরটা দিনে তিন শিফটে ভাড়া দেয়া হতো। এখানেই একটা খাটে আট ঘণ্টার এক শিফটে ঘুমাতেন দুই ভাই। জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে যখন তাঁদের ডেরায় আগুন লাগে তখনও দুই ভাই ঘুমিয়ে ছিলেন।

শীতের রাতে জোয়ান-সোমত্ত দুই ছেলের লাশ নিয়ে কচুয়ার পথে রওনা দিলেন তাঁরা। দুই ভাই বাহরাইনে শ্রমিক ছিলেন। ঠিক কী করতেন সেখানে তা স্বজনদের জানা নেই। আর দশজন বাংলাদেশি শ্রমিকের সাথেই ছিল তাঁদের ডেরা। শেওলা মোড়ানো চার দেয়াল। জানালাবিহীন ছোট্ট ঘর। চারটা বাংক বেড।

অগ্নিকাণ্ডের প্রায় এক মাস পরে জোড়া লাশ নিয়ে কচুয়ার নোয়াপাড়ায় গ্রামে ফিরলেন শাহ আলম। মধ্যরাত। উঠানেই গোছলের বন্দোবস্ত। বাদ ফজর জানাজা। কফিন খুলে দেখেন, পরনে তখনও গেঞ্জি, জিনসের প্যান্ট। নানির কোলেকাঁখেই মানুষ হয়েছেন দুই ভাই, পোড়া লাশ দেখে বুক চাপড়ে বিলাপ করেন তিনি, 'আহা রে, কাম সাইরা পিন্দনের কাপড়ও থোয় নাই। চৌদ্দ-ষোলো ঘণ্টা কাম করছে। এমুন ঘুম, এমুন কেলান্তি, আগুনরেও ডরায় নাই রে...।'

তারও দুই মাস পরে, এপ্রিল মাসের এক শুক্রবারে নোয়াপাড়ায় এসেছি। টাকা-পয়সার অভাবে সময়মতো, দাফনের পরপর লোক খাওয়ানো হয়নি। এখন কিছু টাকা পেয়েছে সরকার থেকে, পাড়ার মুরব্বিরা বাদ জুমা দোয়া-কালাম করবে। উঠানে আয়োজন চলছে। শাহ আলম ভাইয়ের সাথে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আমার জসীম উদ্‌দীনের কবর (১৯৬১) কবিতার কথা মনে পড়ল–

'তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গনিয়া গনিয়া ভুল করে গনি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।'

অনেক যত্নে বাড়ির সামনেই কবর হয়েছে। কবিতার ডালিমগাছ নেই ঠিকই, কিন্তু তিতু আর শাহদাতের চেনা সুপারিগাছগুলো আছে। শাহ আলম ভাই বলেন, 'জোয়ান-সমর্থ দুইটা ছেলে গোর দিলাম। সরকার থেকে টিএনও সাহেব সামান্য যা কিছু দিলেন, কর্জদেনা শোধ করে বিদেশ পাঠাইছিলাম, তা মেটাতেই শেষ। তবু মাটি দিতে পারছি, সবতে তো লাশও পায় না।' অনেক দুঃখ-কষ্ট-হতাশার মধ্যে একটাই সান্ত্বনা–দুই ছেলেকে নিজ হাতে কবরে নামিয়েছেন। সব মৃত শ্রমিকের পরিবারের ভাগ্যে তো লাশ জোটে না, কবর দেয়ার সুযোগ মেলে না!

১

১১ জানুয়ারি ২০১৭। তিতু ও শাহদাতের মৃত্যুর ঠিক চার বছর পরে লেবাননে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেখানকার কর্তৃপক্ষ একটা কড়া চিঠি দেয়। চিঠিতে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে লেবাননের বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গে পাঁচজন বাংলাদেশি নারী শ্রমিকের লাশ পড়ে আছে, তাদের সাথে পাসপোর্ট বা অন্য কোনো পরিচয়পত্র না থাকার কারণে লাশগুলো কোথায় বা কাকে হস্তান্তর করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না।

লেবানন পুলিশের সূত্রে জানা যায়–

২০১৪ সালের কোনো এক মাসে ফজলুল হকের মেয়ে লাকি আখতার সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

১৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে আঁখি আজিজ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন।

১৯ মে ২০১৬ তারিখে হেলেনা বেগম ও রাবিয়া বেগম হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন।

২০ মে ২০১৬ তারিখে শিউলি বেগম হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে শিলা আখতার আত্মহত্যা করেন।

তাঁদের সবার পিতৃপরিচয় কর্তৃপক্ষের জানা। সোহরাব আলীর মেয়ে শিলা আখতার। কিন্তু ভাগ্য ফেরানোর জন্য 'আজকাল কত সোহরাব আলী মেয়েকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়েছেন তার কোনো হিসাব আছে?' চোখ উল্টে জবাব দেন প্রবাসী কল্যাণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা।

'কার খোঁজে ঘুরবে দূতাবাস? কোথায় কার খোঁজ করব আমরা?' অগত্যা লাশগুলো পড়ে থাকে বিদেশ-বিভুঁইয়ের নাম-না-জানা মর্গে। মৃত্যুর পর দেশের মাটি মেলে না ভাগ্যে, বরাদ্দ শুধু একটি জাতীয় দৈনিকের ব্যাক পেজে অষ্টম কলামের এক ইঞ্চি জায়গা। ছোট্ট খবর, কারো চোখে পড়ে, কারো পড়ে না।

এদিকে লেবাননের সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'যদি ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে লাশগুলো আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে না পারে বাংলাদেশ দূতাবাস, তাহলে স্থানীয়ভাবে তাঁদের কবর দিতে বাধ্য হবে।'

২

মধ্যপ্রাচ্যে সস্তা শ্রমের জোগান দেয় বাংলাদেশ। অন্যদিকে ইউরোপ-আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সস্তা শ্রমের খোঁজে আসে এই দেশে। একালে উৎপাদন ও ভোগের ব্যবস্থার সাথে সাথে শোষণ কাঠামোরও বিশ্বায়ন ঘটেছে। বাহরাইনে 'আত্মহত্যা'র পর আঁখির লাশ কবরের অপেক্ষায় পড়ে থাকে। আর ইউরোপ-আমেরিকার বাজারের জন্য পোশাক তৈরি করতে গিয়ে গার্মেন্টস শ্রমিক বেনু রানীর ছিন্নভিন্ন লাশের একাংশ নামা বাজার শ্মশানে দাহ করে পরিবার, অন্য অংশ জুরাইন গোরস্তানে কবর দেয় রাষ্ট্র।

৩

বেনু রানী দাস ও রনি চন্দ্র মণ্ডলের মনের দেয়া-নেয়া ছিল। ওঁরা তালতো ভাইবোন। পারিবারিকভাবে টুকটাক বিয়ের কথাবার্তাও হয়েছে। রোজ একসাথে হেঁটে গার্মেন্টসে যেত। ৮টা বাজার ১০ মিনিট আগে ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে হবে, না হলে হাজিরা বোনাস কাটা যাবে। হন্তদন্ত যাওয়ার পথে কখনও থেমে মোবাইলে বেনুর ছবি তুলত রনি। সেদিনও তুলেছিল।

ছবি তোলার সময় তারিখ রেকর্ড করা আছে মোবাইলে–৭.৩৬.০৭ সেকেন্ড, ২৪ এপ্রিল ২০১৩। ঝাঁকুনি দিয়ে জেনারেটর চালু হওয়ার সাথে সাথেই বিল্ডিং কেঁপে ওঠে, রনি তিনতলার সিঁড়ির কাছের জানালাটা দিয়ে লাফ দেয়। চোখের সামনে ভবন ধসে পড়ে। মাত্র ৩০ সেকেন্ডের ব্যবধান। ৩০ সেকেন্ড। নইলে, রনি আর বেনুর ভাগ্য একাকার হয়ে যেত।

দিন নেই রাত নেই রনি বেনুর লাশ খুঁজল। মোবাইল থেকে সকালে তোলা ছবিটা বের করে প্রিন্ট করাল। যত্ন করে নিখোঁজ শ্রমিকের পোস্টার সেঁটে দিল সব জায়গায়। অধরচন্দ্র কলেজের মাঠ থেকে এনাম মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল, এনাম থেকে দ্বীপ ক্লিনিক, দ্বীপ থেকে রানা প্লাজার সামনে। এভাবে দিনরাত ঘুরে ঘুরে ১৩ দিনের দিন (৭ মে ২০১৩) বেনু রানীকে পাওয়া গেল। থেঁতলানো লাশ। কামিজের প্রিন্ট দেখে শনাক্ত করল। প্রশাসন ইতস্তত করে, লাশ দেয়া কি ঠিক হবে? বেনুর মা সরজিতা দাস বিলাপ করতে করতে বাড়ি ছুটে যান, সেলাই মেশিনের ড্রয়ার থেকে কামিজের ছাঁটকাপড় নিয়ে আসেন। কদিন আগেই বানিয়েছে এই কামিজের সেট। শ্যাওলা সবুজ, ছাই আর সাদা রঙের ফুল-লতাপাতার ছিটকাপড়। বেনুর ছিল লম্বা চুল। ধুলাবালিতে কালো চুল ধূসর হয়ে আছে। মা চুল দেখিয়ে দৃঢ় স্বরে বলেন, ' এটা আমার মেয়ে।' দাহ হয় নামা বাজার শ্মশানে।

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু হয়নি।

৩ নভেম্বর ২০১৩। রানা প্লাজা নিখোঁজ শ্রমিকদের ডিএনএ টেস্টের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। রনি ব্যস্ত হয়ে আমাকে ফোন করল। হকচকিত কণ্ঠে বলল, 'বেনুর তো কবর পাওয়া গ্যাছে।' জিজ্ঞেস করে, 'ডিএনএ টেস্টে কি ভুল হয়?' এদিকে পরিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুদানের চেক নিয়ে এসেছে। আড়ালে দু-একজন বলছে, টাকার লোভে কোন মুসলমানের মেয়ের লাশ পুড়িয়ে দিল কে জানে? রনি বারবার বলতে থাকে, 'আমি চিনেছি। আমার চিনতে ভুল হয়নি।' বেনুর মা বলেন, 'আমার মেয়ের চুল আমি হাতায়ে দেখছি। আমার চিনতে ভুল হয়নি।' দাহ-শ্রাদ্ধের মধ্য দিয়ে শোকের একটা কিনারা হয়েছিল। এখন এই নতুন পাওয়া তথ্যে সবাই বিমূঢ়। ঘটনার ছয় মাস পরে বেনুর মা আবার বিছানা নেন।

সরজিতা দাস দিনরাত মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদেন। এখন তিনি কী করবেন? সরকারকে চিঠি দেবেন? কবর থেকে দেহ তুলে আবার সৎকার হবে? এক ডিএনএর কলম দিয়ে মায়ের বয়ান নাকচ হয়ে গেল। বেনুর বাবা গিরীন্দ্র দাসকে সাথে নিয়ে রনি যায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে দেখা করতে। কল্পনাতীত এক সামাজিক পরিস্থিতির মুখোমুখি ইউএনও নিজেও বিচলিত হয়ে পড়েন, কী বলবেন? বাড়ি ফিরে গিরীন্দ্র দাস একবুক অনুশোচনা নিয়ে বারবার বলতে থাকেন, 'ছোটবেলা থেকে মেয়ের নুন খাইছি, স্কুলে দেই নাই, পড়ালেখা করাই নাই। এখন ধর্মমতে দাহটাও দিতে পারলাম না!'

জুরাইন গোরস্তানে এসএমসি-৯৫, লাইন নং-৮, কবর নং-এ/২৩–বেনু রানী দাসের দেহাবশেষ এখানে থাকতে পারে। কিন্তু কবরের কাছে বেনু রানীর পরিবার কখনও যায়নি।

> 'আজকাল কত সোহরাব আলী মেয়েকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়েছেন তার কোনো হিসাব আছে?' চোখ উল্টে জবাব দেন প্রবাসী কল্যাণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা। 'কার খোঁজে ঘুরবে দূতাবাস? কোথায় কার খোঁজ করব আমরা?' অগত্যা লাশগুলো পড়ে থাকে বিদেশ-বিভুঁইয়ের নাম-না-জানা মর্গে।

৪

তিতু, শাহদাত, লাকি আখতার, আঁখি আজিজ, হেলেনা বেগম, রাবিয়া ও শিউলি বেগম, শিলা আখতার, বেনু রানী দাস–এবং আরও অনেকেই। তাঁদের জীবন-মৃত্যুর কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটা নির্দয় দাবির মুখোমুখি হই আমরা–মৃত শ্রমিকের সম্মানজনক কবর, সৎকারের দাবি। এই দাবি বাংলাদেশে শ্রম সম্পর্কের বিমানবীকৃত (dehumanized face of labour relations) বাস্তবতার মুখোমুখি করে আমাদের। এখানে আক্ষরিক অর্থেই শ্রমিককে তার কারখানার যন্ত্রাংশের মতো প্রাণহীন কিছু একটা, বস্তুবিশেষ বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্র ও কারখানা কর্তৃপক্ষের চোখে শ্রমিকের মৃত্যুর একটি সংকীর্ণ মানে দাঁড়ায়–একজন মানুষের কর্মক্ষমতা/উৎপাদন ক্ষমতাহানি বা একটি পরিবার থেকে উপার্জনক্ষম সদস্যের বিয়োগ। আমাদের শ্রম আইন (২০০৬, ২০১৩) অনুযায়ী মৃত্যু 'উপার্জনক্ষম শ্রমিকের স্থায়ী সম্পূর্ণ [আর্থিক] অক্ষমতার' সমরূপ (ধারা ১৯, ১৫০-১৫১) ধরে নেয়া হয়। স্বজন হারানোর দুঃখকষ্টের বদলে উপার্জনক্ষমতাহানির হিসাব-নিকাশ, মানে মৃত্যুর মূল্য নির্ধারণ (monetizing death) করা হয়, চলতি ভাষায় যাকে আমরা ক্ষতিপূরণ বলি। তাই কারখানায় যে কোনো দুর্ঘটনা/হত্যাকাণ্ডের পরেই সরকার-মালিকপক্ষকে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দিতে দেখা যায়। এই ঘোষণা ও ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণের মাধ্যমে শ্রমিকের মৃত্যু/কাঠামোগত হত্যার প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করার পাঁয়তারা চলে। কিন্তু বেওয়ারিশ লাশ হওয়ার সম্ভাবনা ও শর্তে যখন শ্রমিক কারখানাতে যোগ দেয়, তখন ক্ষতিপূরণের মাধ্যমেও মৃত

শ্রমিকের দাবি অনিষ্পন্ন থাকে। টাম্পাকো অগ্নিকাণ্ডে (১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬) নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবারকে মালিকপক্ষ শ্রম আইনে ধার্য ক্ষতিপূরণের টাকা থেকেও বেশি দিতে প্রস্তুত, তবে লাশ বুঝিয়ে দিতে অপারগ।

৫

টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডের মেশিন অপারেটর ছিলেন আনিসুর রহমান। অগ্নিকাণ্ডের এক বছর হয়েছে। কিন্তু তাঁর লাশ পড়ে আছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে। লাশের খোঁজে তাঁর স্ত্রী ও ভাই একবার মালিবাগের সিআইডি অফিসের ডিএনএ টেস্টিং সেন্টারে ফোন করেন, আরেকবার টঙ্গী থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে ফোন করেন। কোনো সদুত্তর পান না। অগত্যা চেনাজানা সাংবাদিকদের শরণাপন্ন হন। একদিন (১৫ জুলাই ২০১৭) এ বিষয়ে খোঁজ নিতে টঙ্গী থানায় আমিও ফোন করি।

আমি : টাম্পাকোতে আগুনের পরে প্রায় দশ মাস হয়ে গেছে, লাশ শনাক্ত করে হস্তান্তর করার ব্যাপারে কতদূর কী অগ্রগতি হলো?

তদন্ত কর্মকর্তা : লাশের যা আছে তা প্রায় পুড়ে ছাই। মাংস যা আছে শুকায়ে গ্যাছে। এতদিন হয়ে গেছে, বুঝেন না? এখন স্যাম্পল পরীক্ষার উপযোগী নাই। কী করা যাবে বলেন। আমি দ্বিতীয়বার মর্গ থেকে স্যাম্পল নিয়ে দিছি সিআইডি অফিসে। তাঁরা মেডিসিনে ডুবায়ে রাখছে। যদি রসে ভিজে কিছু পরীক্ষার উপযোগী মাংস বাজে, তাহলে কাজ হবে। ডিএনএ টেস্ট করা যাবে। আমরা বুঝায়ে দেব লাশ।

আমি : কতদিন লাগতে পারে?

তদন্ত কর্মকর্তা : আরে ভাই, হাড্ডি-মাংস আলাদা হয়ে গ্যাছে। রসে ভিজায়ে রাখছে, কতদিন কি বলা যায় না। শুকনা-পোড়া মাংস ডিএনএর জন্য রসে ভিজায়ে রাখছে। দ্যাখেন কী হয়। হইতেও পারে। বুঝলেন না। রসে ভিজায়ে রাখছে।

> বাড়ি ফিরে গিরীন্দ্র দাস একবুক অনুশোচনা নিয়ে বারবার বলতে থাকেন, 'ছোটবেলা থেকে মেয়ের নুন খাইছি, স্কুলে দেই নাই, পড়ালেখা করাই নাই। এখন ধর্মমতে দাহটাও দিতে পারলাম না!'

আনিসুর রহমান এখন মালিবাগের সিআইডি অফিসের ডিএনএ টেস্টিং ল্যাবরেটরির একটা নম্বর মাত্র। এই নম্বর, কারখানার আগুনে পুড়ে এই মৃত্যু মুছে দেয় তাঁর অস্তিত্ব–একজন শ্রমিক, যার সমাজজীবন আছে, ইতিহাস আছে, ওয়ারিশ আছে।

বড় ছেলের বয়স পাঁচ, আর ছোটটার মাত্র এক বছর হলো। তাঁর এক মামা মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন অনেক বছর আগে। নানা রকম কাজ করে দেশে টাকা পাঠাতেন। গত বছর (২০১৬) মে মাসে সেই মামা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। অবৈধ শ্রমিকের লাশ দেশে আনা সহজ না। বহু চেষ্টার পর আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে লাশ দেশে এসে পৌঁছায়। আনিসুর এয়ারপোর্ট থেকে মামার লাশ নিয়ে দেশের বাড়ি যান। দাফন-কাফন করে টঙ্গীতে ফেরার ঠিক ১২ দিন পরে সকালের শিফটে কারখানায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। লাশ শনাক্ত করা যায় না। সাদা বডি ব্যাগে আরও কয়েকটি পুড়ে অঙ্গার লাশের সাথে আনিসুরের শেষযাত্রা থেমে থাকে ডিএমসিএইচ মর্গে। কবরের মাটির বদলে দেহাবশেষ ডিএনএ টেস্টিং ল্যাবের বোতলে মেডিসিনে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে।

এই বিমানবীকরণ, একজন শ্রমিকের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিবাদে কবরের দাবি নিয়ে তীব্র দুঃখ-ক্রোধ ও অবর্ণনীয় সাহস নিয়ে আনিসুর রহমানের স্ত্রী শারমিন আক্তার শিল্পী একাই লড়ে যাচ্ছেন। পত্রিকার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে লাশ ফেরত চেয়ে চিঠি লিখেছেন। কারখানার মালিক কর্তৃপক্ষকে ফোন করে জানতে চান, 'লাশ না পাই, মৃত্যুর সনদ পাওয়ার অধিকারও কি নেই?' কারখানা কর্তৃপক্ষ বলে, 'লাশ পাওয়া যায়নি, দাফন হয়নি, মৃত্যু সনদ তো আমরা দিতে পারব না।' তারা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছে, তাঁর স্ত্রীকে চাকরি দিতেও প্রস্তুত; কিন্তু আনিসুর রহমান টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডের কর্মরত একজন শ্রমিক ছিলেন এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন–এই মর্মে কোনো কাগজ দিতে রাজি নয়। একটা মৃত্যুকে গ্রহণ করে নেয়ার দাপ্তরিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রক্রিয়া অবশেষে একটা সনদের অভাবে অমীমাংসিত থেকে যায়। মৃত শ্রমিকের কবরের দাবি এই নিষ্ঠুর বাস্তবতায় প্রোথিত।

৬

আরও নির্মম হলো, যখন শ্রমিক আন্দোলনের সাথীরা প্রশ্ন করেন, মৃত শ্রমিকের কবরের দাবির সাথে সংগ্রামরত শ্রমিকের দাবির সমন্বয় কিভাবে ঘটবে? প্রশ্নটা এই পূর্বানুমান থেকে করা হয় যে মৃত শ্রমিকের সম্মানজনক কবর, সৎকারের দাবিটা আপাত অর্থে শ্রম সম্পর্কের যে আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন আমরা দেখি, তার সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা তো শ্রমিকের স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই, গার্মেন্টস সেক্টরে কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই, শ্রমিকের জন্য বাঁচার মতো মজুরি চাই। বলা হয়, এই রাজনৈতিক স্বপ্ন-কল্পনার সাথে মৃত শ্রমিকের মাটির অধিকারের দাবির কৌশলগতভাবে একটা অসংগতি আছে।

প্রায় দশ বছর কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে যুক্ত একজন সংগঠক আমাকে বললেন, 'আমরা তো আর একজন শ্রমিকেরও এমন নৃশংস মৃত্যু দেখতে চাই না, তাহলে কবরের দাবি তো একটা বিচ্ছিন্ন না হলেও সাময়িক প্রসঙ্গ।' আবার টাম্পাকো অগ্নিকাণ্ডে অশনাক্ত শ্রমিকদের লাশ মাসের পর মাস মর্গে ফেলে না রেখে স্বজনদের বুঝিয়ে দেয়ার দাবিতে সমাবেশের আয়োজন নিয়ে আলাপ করছি আমরা। তখন একজন জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা একই প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু লাশ হস্তান্তরের আন্দোলনে মনোনিবেশ করলে বৃহত্তর আন্দোলন থেকে মনোযোগ সরে যাবে না? মৃত শ্রমিকের দাবিদাওয়া–কবর/সৎকারের অধিকার বা ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন–বৃহত্তর শ্রমিক স্বার্থকে সরাসরি এগিয়ে নিয়ে যায় না।' বাঁচার মতো মজুরি আর কবরের অধিকারের দাবির মধ্যকার আপত দ্বন্দ্বকে ঘিরে শ্রমিক আন্দোলনের মিছিল-সমাবেশে আমরা তর্ক করি।

এই দ্বন্দ্ব নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবারের জন্যও সমানভাবে বাস্তব। কবরের দাবিতে, লাশের খোঁজে কিংবা ক্ষতিপূরণের টাকা নিতে প্রেস ক্লাবের সামনের মিছিলে, ডিএনএ অফিস কিংবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ধরনা দেয়ার আর্থিক সংগতি বা সময় তো নাই বেশির ভাগ শ্রমিক পরিবারের হাতে। তাজরীন অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ শ্রমিক জায়েদার স্বামী দিনমজুর। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যেদিন (২৮ অক্টোবর ২০১৩) ক্ষতিপূরণের টাকা বিতরণ করা হয়, সেদিন তিনি ফসল তোলার কাজে কামলা খাটতে রংপুর থেকে নোয়াখালী গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মিঠাপুকুরের স্থানীয় প্রশাসনের কোনো এক কর্মকর্তা ৭ লাখ টাকার মধ্যে ২ লাখ টাকা মেরে দেন। সেই টাকা জায়েদার পরিবার আজও উদ্ধার করতে পারেনি। কবর ও ক্ষতিপূরণের আশায় কয়েক মাস মিছিল করে একই অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ আসমার বাবা তফরউদ্দীন হতাশ হয়ে রাজপথ ছেড়ে দেন। বলেন, 'আর কত

অ্যাবসেন (absent) দিমু? টাকা কাটে, মাসে তিনবার অ্যাবসেন করলে [গার্মেন্টসের] পিএম বেতন আটকে রাখে।' শ্রমিক শ্রেণীর দৈনন্দিন সংগ্রামে মৃত স্বজনের কবরের দাবি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যেসব অসম নিয়ম ও শোষণমূলক শর্তের অধীনে একজন শ্রমিক কারখানায় কাজ করে, তারই প্রভাব হলো শ্রমিকের সার্বিক বিচ্ছিন্নতা-বিচ্যুতি, যেখানে সে তার আপনজনের (পরিবার, সহকর্মী, শ্রেণী ও সংগ্রামের সাথী) জীবনে, কখনও কখনও চলমান শ্রমিক আন্দোলনেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আজকের বৈশ্বিক সস্তা শ্রমের বাজারে যোগ দিয়ে অভিবাসী বা গার্মেন্টস শ্রমিক যে শোষণের সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত হয়, তা এতটাই সর্বগ্রাসী। বিচ্ছিন্নভাবে, শ্রমিক তার মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে হাতে শক্ত করে কারখানার আইডি কার্ড বেঁধে রেখে অথবা অন্য কোনো উপায়ে কবরের দাবি তুলেছে, তার অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার এই প্রক্রিয়াকে রুখে দাঁড়িয়েছে।

৭

একটি ফটোগ্রাফ। পুরো শরীরই [রানা প্লাজার] ডেবরিসের তলায়। তবে ডেবরিসের ওপর দৃশ্যমান আছে শরীরের আরও একটু অংশ; একটা হাতের কবজি আর আঙুলে ফিতা পেঁচানো আইডি কার্ড।
মুখ দেখে বোঝা যায়, ছেলেটির বয়স কেনোক্রমেই আঠারোর বেশি নয়। নিতান্ত কিশোর। আঙুলে এমনভাবে প্যাঁচ দিয়ে সে তার আইডি কার্ড বেঁধে রেখেছিল, যেন শরীর-মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও প্রিয়জন-পরিজন তাকে চিনে নিতে পারে।

অস্তিত্ববাদের দার্শনিক কিয়ের্কেগাদের তত্ত্ব তাঁর জানা নেই সেটা ধরে নিয়ে বলব, অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ার এই ব্যাপকতাগ্রাসী আতঙ্ক মানুষের সাধারণ ইন্সটিংক্ট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নিও-ক্যাপিটালিজম, নিও-লিবারালাইজেশনের সমাজ-অর্থনৈতিকতার বাস্তবতায়। কিন্তু ওই ফটোগ্রাফের কিশোর আঙুলে যতগুলো প্যাঁচ দিয়ে পরিচয়পত্র আটকে রেখেছে, তা তার সাম্প্রতিক বাস্তবতার রিফ্লেকশন নয় কি? অস্তিত্বময় থেকে অস্তিত্বহীন করে ফেলার একটি পোর্ট্রেট।

'একটি অস্তিত্ববাদী ফটোগ্রাফ এবং অস্তিত্বহীনের বাস্তবতা', শামীমা বিনতে রহমান, ২০১৩

এই আলোকচিত্রের বালকের মতো তাজরীন অগ্নিকাণ্ডে নিহত পলাশও তাকে বেওয়ারিশ করার আয়োজনকে রুখে দাঁড়িয়েছে। যখন বুঝতে পারে জীবিত ফিরে আসার আর কোনো পথ নেই, তখন পলাশ মাকে ফোন করে, 'পঞ্চম তলার বাথরুমে আছি আমি। আমার পরনে কালো টি-শার্ট, কোমরে একটা শার্ট বাঁধা। আমাকে এখানেই পাবে।' আমার কাছে পলাশের এই ডাক, আকুতি শ্রমিকের জীবন যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় খরচযোগ্য মনে করে, সস্তা শ্রমের বিশ্ববাজারে উদ্বৃত্ত জীবন মনে করে–একজন মরে গেলে আরেকজনের জোগান আছে–সেই শোষণের সম্পর্ক ভাঙার আহ্বান। শ্রমিক শ্রেণীর কবর/সৎকারের অধিকারের দাবি তার অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন, বিস্মৃত করার আয়োজনকে রুখে দাঁড়ানোর ডাক। এক বছর এক মাস মর্গের হিমাগারে শায়িত ছিন্নভিন্ন-অশনাক্ত-বরফাবৃত লাশের মাঝে বন্দি আছে মুক্তির আশ্বাস। শিকল ভাঙার ক্রোধ।

সায়দিয়া গুলরুখ : গবেষক, সাংবাদিক।
ইমেইল : gulrukhsaydia@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১. জসীম উদ্‌দীন, সুচয়নী, পলবী প্রকশনী, ঢাকা, ১৯৬১।
২. বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি, হাজার প্রাণের চিৎকার, ঢাকা, ২০১৪।
৩. শামীমা বিনতে রহমান, 'একটি অস্তিত্ববাদী ফটোগ্রাফ এবং অস্তিত্বহীন বাস্তবতা', আলাল ও দুলাল ব্লগ, ২৮ এপ্রিল ২০১৩।
৪. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ২০১৩।

সংগৃহীত